ইউনিট- ১৯

জৈব প্রযুক্তি

ভূমিকা

মূলা যদি হয় দুই মণ, গরু থেকে যদি সরাসরি পাই ননীহীন দুধ, আপেলের স্বাদ যদি গাজরে পাই, যদি স্বাদযুক্ত শসা পাই, পোকার আক্রমন প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন তুলা গাছ যদি পাই, হ্যা, এটা আমাদের কাছে কল্পকাহিনীর মত মনে হলেও এটা কিন্তু আর কল্পকাহিনী থাকছে না, রীতিমত বাস্তব হয়ে উঠছে। ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে যখন রিকম্বিন্যান্ট ডি.এন.এ-র কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কৃত হয়, তখনই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়ে যান ভবিষ্যতে তাঁরা প্রাণীজ ও উদ্ভিদ খাদ্যকে যে কোন রকমভাবে পরিবর্তিত করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সম্ভব বায়োটেকনোলজি (biotechnology) বা জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে।

কোন জৈবিক প্রক্রিয়া বা উহার অংশ বিশেষকে মানব কল্যাণে ব্যবহারের প্রযুক্তিকে বলা হয় বায়োটেকনোলজি বা জৈব প্রযুক্তি (biotechnology)। বায়োটেকনোলজী শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন হাঙ্গেরিয়ান কৃষি অর্থনীতিবিদ কার্ক ইরেকী (Kark Ereky) ১৯১৯ সালে। যদিও মানব সভ্যতায় জৈব প্রযুক্তি তথা ফার্মেন্টেশন (fermentation) বা গাঁজানো প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল তৈরি পদ্ধতি অতি প্রাচীন, প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন। কিন্তু "বায়োটেকনোলজি" কেবলমাত্র সত্তর দশকের পর থেকে, অর্থাৎ আণবিক জীববিজ্ঞানের (molecular biology) কলাকৌশল ও আধুনিক শিল্পে তাদের প্রয়োগ প্রসার লাভের ফলে বহুলভাবে প্রচলিত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান মানব কল্যাণে জীবকে ব্যবহার করার কলাকৌশল একের পর এক আবিষ্কার করে চলেছে। এর দ্বারা আমরা পাচ্ছি, নতুন অধিক ফলনযুক্ত ফসল উদ্ভিদ, পরিবেশ হচ্ছে দূষণমুক্ত, মানব সমাজ বিভিন্ন ধরণের রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছে।

মানুষ জীবের উৎপত্তি সন্ধানে সবসময় ব্যাকুল, আর একাজটি করতে যেয়ে, তারা জেনেছে জীবিত কোষের গঠন প্রক্রিয়া, বিভিন্ন অংশের কাজসহ এদের অণু পর্যায়ের গঠন প্রকৃতি (ultrastucture) ও উপাদান সম্পর্কে। এরপর শুরু হয় কোষ থেকে কোষ তৈরী, তথা জীব তৈরী প্রযুক্তির উদ্ভাবন। আর এটা করতে যেয়ে আবির্ভাব ঘটে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির। উদ্ভিদে টিসু কালচারের মাধ্যমে এক বা একাধিক কোষ থেকে প্রথমে গুচ্ছকোষ বা ক্যালাস সৃষ্টি এবং পরে স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্ভিদ তৈরীর ফলে চারা উৎপাদনে বীজের প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কমে এসেছে।

প্রযুক্তি বাস্তবায়নে অনুজীবের ব্যবহার ব্যাপক। অণুজীব ব্যবহার করে বর্জ্য পদার্থ থেকে বায়োগ্যাস, প্রোটিন ও পানি শোধন পদ্ধতি বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া অণুজীব ব্যবহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধক টিকা, অ্যান্টিবায়োটিক, বিভিন্ন এনজাইম ইত্যাদি তৈরি সম্ভব হয়েছে।

এ ইউনিটটি ৬ টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে। পাঠগুলি নিম্নরূপ-

পাঠ- ১ ঃ জৈব প্রযুক্তি ও টিস্যু কালচার
পাঠ- ২ ঃ বায়োগ্যাস (ইরড়-এধং)
পাঠ- ৩ ঃ এনজাইম ও দুগ্ধজাত দ্রব্য
পাঠ- ৪ ঃ পরিবেশ ও জৈব প্রযুক্তি
পাঠ- ৫ ঃ টিকা ও অ্যান্টিবায়োটিক
পাঠ- ৬ ঃ জিন প্রযুক্তি

পাঠ- ১ঃ জৈব প্রযুক্তি ও টিস্যু কালচার

এ পাঠ শেষে আপনি—

- জৈব প্রযুক্তির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- টিস্যু কালচার কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- টিস্যু কালচার প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন।
- উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

জৈব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি (Biotechnology)

জৈব প্রযুক্তি হচ্ছে এমন একটি জৈবিক প্রক্রিয়া বা উহার অংশ বিশেষ, যার মাধ্যমে মানব কল্যাণকর কোন বস্তু বা উপাদান তৈরি করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে জৈব প্রযুক্তি প্রসার লাভ করে সত্তর দশকের পর থেকে, যখন আণবিক জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন কলাকৌশল আধুনিক শিল্প ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হতে থাকে।

সংজ্ঞা ঃ জৈব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি বা কৌশল, যার মাধ্যমে কোন জীব বা জীবিয় উপাদান ব্যবহারের দ্বারা মানব কল্যানে বিভিন্ন প্রকার উপকারী বা ব্যবহার উপযোগী বস্তু বা উপাদান তৈরী করা হয়।

টিস্যু কালচার বা টিস্যু আবাদ (Tissue Culture)

জীবদেহের গঠন ও কার্যকারিতার একককে কোষ বলে। জীবদেহ এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত। উৎপত্তিগত ভাবে একই কাজ করে এমন ধরণের সম বা ভিন্ন আকৃতির কোষ সমষ্টিকে টিস্যু (tissue) বলে। এ টিস্যুকে জীবাণু মুক্ত কোন পুষ্টিযুক্ত মিডিয়ামে (nutrient medium) চাষ ও বৃদ্ধি করাকে সংক্ষেপে টিস্যু কালচার (tissue culture) বলে। টিস্যু কালচার উদ্ভিদ বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা এবং এ শাখার সাথে অন্যান্য শাখাসমূহ যেমন- উদ্ভিদ প্রজনন, বংশগতিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা *ইত্যাদি* অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সংজ্ঞা ঃ উদ্ভিদের কোন বিভাজনক্ষম বিচ্ছিন্ন অংশ যেমন- শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচিপাতা, পত্রবৃন্ত, পরাগধানী, ভ্রূণ, ডিম্বক ইত্যাদিকে বা এদের একক কোষ বা কোষ সমষ্টিকে জীবাণুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক মাধ্যমে কালচার বা আবাদ করাকে টিস্যু কালচার (tissue culture) বলে। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উল্লিখিত টিস্যু থেকে অধিক সংখ্যক নতুন চারা উদ্ভিদ উৎপাদনই টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

টিস্যু কালচার জৈব প্রযুক্তির একটি নতুন মাধ্যম হলেও, ইতোমধ্যে এ প্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্ভিদ উৎপাদন ও উদ্ভিদের মান উন্নয়নের ব্যাপক সফলতা এসেছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের টিস্যু কালচার পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে এবং এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বানিজ্যিকভাবে উদ্ভিদ চারা উৎপাদন করা হচ্ছে। ফলে টিস্যু কালচার পদ্ধতি ইতোমধ্যে এ সমস্ত দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে।

টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় একটি কোষ, কোষগুচ্ছ বা টিস্যু, একটি সম্পূর্ণ অঙ্গ বা সম্পূর্ণ এককোষী জীব কালচার করা যায়, অর্থাৎ টিস্যু কালচারের অর্থ ব্যাপক। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। যেমন-

- কান্ডাগ্র কালচার (Shoot-tip culture)
- ভাজক কলার কালচার (Meristem culture)
- মূলের কালচার (Root culture)
- ক্যালাস কালচার (Callus culture)
- পরাগধানী বা পরাগরেণু কালচার (Anther or pollen)
- ভ্রূণ *কালচার* (Embryo culture) ইত্যাদি।

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি (Tissue culture technology)

নিচে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

(১) টিস্যু কালচারের জন্য প্রাথমিকভাবে একটি কালচার মিডিয়াম তৈরীর প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে উক্ত কালচার মিডিয়ামে, উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের মুখ্য ও গৌণ উপাদান (macro and micro elements), ভিটামিন, সুক্রোজ, ফাইটোহরমোন ইত্যাদি কালচার মিডিয়ামে থাকা আবশ্যক।

(২) উক্ত কালচার মিডিয়ামকে টেস্টটিউব বা কনিক্যাল ফ্লাক্সে নিয়ে জীবাণুমুক্ত (অটোক্লেভের সাহায্যে) করা হয়।

(৩) উদ্ভিদের যে নির্দিষ্ট অংশ বা অঙ্গ কালচার করা হবে, প্রয়োজন হলে সেটাকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। অত:পর উক্ত উদ্ভিদাংশকে তৈরীকৃত মিডিয়ামযুক্ত টেস্ট টিউব বা কনিক্যাল ফ্লাক্সে নির্দিষ্ট আলো ও তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া হয়। পরে কালচারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, কালচার করা টিস্যুতে পরিবর্তন দেখা দেয়। মিডিয়ামে স্থাপিত টিস্যু বার বার বিভাজনের মাধ্যমে প্রথমে অনেকগুলি আকারবিহীন টিস্যুগুচ্ছ তৈরী করে, একে ক্যালাস (callus) বলে। পরে ক্যালাস থেকে ধীরে ধীরে চারা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

(৪) এ উৎপাদিত নতুন চারা উদ্ভিদে মূল সৃষ্টি না হলে, নির্দিষ্ট উচ্চতা লাভের পর কান্ডগুলিকে কালচার থেকে আলাদা করে নতুন মূল উৎপাদনকারী মিডিয়ামে স্থাপন করে রেখে দেওয়া হয়।
(৫) নির্দিষ্ট সময় পর উক্ত চারা উদ্ভিদে নতুন মূল সৃষ্টি হয় এবং পূর্ণাঙ্গ চারা উদ্ভিদে পরিণত হয়।
(৬) পূর্ণাঙ্গ চারা উদ্ভিদ উৎপাদনের পর, একে কালচার মিডিয়াম থেকে আলাদা করে ছোট মাটির পট বা পাত্রে -এর চাষ করা হয়।
(৭) ছোট পাত্রে উদ্ভিদ সফলভাবে জন্মানোর পর, উক্ত উদ্ভিদকে মাঠ পর্যায়ে চাষ করা হয়।
[উপরোক্ত চিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগ ভেদে ভিন্ন হতে পারে।]

চিত্র ১৯.১ ঃ টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়।

বর্তমানে টিস্যু কালচার প্রযুক্তিকে বিভিন্ন প্রকার গবেষণায় ব্যবহার করা হচ্ছে। উদ্দেশ্যভেদে টিস্যু কালচার প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্নতর হয়। টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে; কোন উদ্ভিদ থেকে কোন ধরণের টিস্যু নেওয়া হবে এবং তাদের বৃদ্ধির জন্য কোন ধরণের মিডিয়াম ব্যবহার করা হবে।

উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি

বায়োটেকনোলজি বা জৈব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষিতে যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এখন উদ্ভিদ কোষ বা টিস্যু থেকে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর থেকে উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজননবিদরা ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছেন। বিশেষ করে বীজ উৎপাদনে অক্ষম উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চারা উৎপাদন সম্ভব।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ (যেমন- ফুল, ফল, শস্য, ওষুধ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ) এর চাহিদা বিশ্বব্যাপী। এমতাবস্থায় একমাত্র টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প পরিসরে অধিক চারা উৎপাদন সম্ভব।

এ প্রযুক্তিকে বানিজ্যিকভাবে কাজে লাগিয়ে অর্কিড, গ্লাডিওলাস, টিউলিপ ও লিলিসহ বহু ফুল ও ফল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ আবাদের মাধ্যমে কৃষি শিল্পে এক বিপ্লবের সম্ভব হয়েছে।

মেরিস্টেম বা ভাজক টিস্যুর কালচারও টিস্যু কালচার প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। উদ্ভিদের শীর্ষ মুকুলের অগ্রভাগের টিস্যুকে মেরিস্টেম বা ভাজক টিস্যু বলা হয়। মেরিস্টেম বা ভাজক টিস্যু অঞ্চলের কোষগুলি এত দ্রুত বিভাজিত হয় যে, সেটা রোগ-জীবাণুমুক্ত থাকে। তাই কোন উদ্ভিদের মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে নতুন রোগমুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া অধিকতর সহজ।

পরাগধানী বা পরাগরেণু কালচার -এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড (n) উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব। উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদসমূহ অতি প্রয়োজনীয়। প্রচলিত সাধারণ উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতিতে বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত হোমোজাইগাস লাইন (homogygous line) পাওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ। কিন্তু পরাগরেণু বা পরাগধানী কালচারের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব হলে সেটা থেকে সহজেই প্রত্যাশিত ডিপ্লয়েড (2n) উদ্ভিদ পাওয়া যায়।

যথাযত সংরক্ষণের অভাবে পৃথিবী থেকে অনেক মূল্যবান উদ্ভিদ চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্ত বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা অতি জরুরী এবং এজন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তিই হচ্ছে উপযুক্ত মাধ্যম। কেননা এ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে উল্লিখিত উদ্ভিদ থেকে অধিক চারা উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব।

ভ্র□ণ কালচার হলো টিস্যু কালচার প্রযুক্তির আর একটি বিশেষ দিক। ভ্র□ণ কালচার প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার অনেক সমস্যা সমাধান হয়েছে। বিশেষ করে আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়নের (inter species hybridization) ক্ষেত্রে ভ্র□ণ *পূর্ণতা* লাভ করে না, ফলে সংকর উদ্ভিদ পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে সংরায়নের পর ভ্র□ণ *কালচার করা হয়। ফলে* ভ্র□ণ *আর* নষ্ট হতে পারে না এবং পরবর্তীতে ভ্রুণ বিকাশের ফলে নতুন পূর্ণাঙ্গ সংকর উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এভাবে উৎপন্ন সংকর উদ্ভিদের সাহায্যে উন্নত জাতের উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়। অনেক উদ্ভিদ প্রজাতি যৌন জননে অক্ষম (sexual incompatible)। এক্ষেত্রে উক্ত উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্ট সংযোগের মাধ্যমে সংকরায়ন সম্ভব হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট সংকর (hybrid) উদ্ভিদ থেকে স্বাভাবিক উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে।

একই টিস্যু কালচারে সৃষ্ট উদ্ভিদসমূহের মধ্যে জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা দেখা যায়। একে সোমাক্লোনাল ভিন্নতা বা ভ্যারিয়েশন (soma clonal variation) বলে। এরূপ সোমাক্লোনাল ভেরিয়েশনকে কাজে লাগিয়ে উন্নত ও কাংখিত বৈশিষ্ট্য (যেমন- অধিক পুষ্টি মান, রোগ প্রতিরোধী) সম্পন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

- কোন জীব বা জীব অংশকে মানব কল্যাণে প্রয়োগের প্রযুক্তিকে জৈব প্রযুক্তি বা Biotechnology বলে।
- উদ্ভিদের কোন বিভাজনক্ষম বিচ্ছিন্ন অংশ জীবাণুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক মিডিয়ামে আবাদ করাকে টিস্যু কালচার (tissue culture) বলে।
- টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় একটি উদ্ভিদাংশ থেকে অতি স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে এবং স্বল্প পরিসরে অধিক সংখ্যক চারা উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব।
- টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় উন্নত জাতের উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জৈব-প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি কত দশকে ব্যপকতা লাভ করে।

ক. ষাটের দশকে   খ. আশির দশকে
গ. সত্তরের দশকে   ঘ. নব্বই -এর দশকে

২। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য কি?

ক. উন্নত মানের বীজ উৎপাদন করা   খ. নতুন টিস্যু উৎপাদন করা
গ. নতুন টিস্যু সৃষ্টি করা   ঘ. বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে নতুন চারা উৎপাদন করা

৩। কোনটি টিস্যু কালচার প্রযুক্তি নয়?

ক. ঈস্ট কালচার   খ. পরাগরেণু কালচার
গ. কক্ষমুকুল কালচার   ঘ. ক্যালাস কালচার

পাঠ ২ ঃ বায়োগ্যাস (Bio-Gas)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বায়োগ্যাস কি তা বলতে পারবেন।
- বায়োগ্যাস তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বায়োগ্যাসের ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন।

মানবজীবনে জ্বালানীর গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক যুগ আগে থেকে আমাদের দেশে রান্নাবান্নার কাজে, কলকারখানায়, ইটের ভাটায়, বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে জ্বালানী হিসেবে কাঠ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফলে বনজ সম্পদ ও গ্রামীন গাছপালা উজাড় হয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। কাঠের জ্বালানীর বিকল্প হলো জীবাশ্ম জ্বালানী যথা- খনিজ তেল, খনিজ কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। বাংলাদেশে এযাবৎ প্রাপ্ত ও আহরিত জীবাশ্ম জ্বালানীর মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসই উল্লেখযোগ্য। সিলেটের হরিপুরে তেল প্রাপ্তির ফলে এক্ষেত্রে কিছু উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এছাড়া আরও নতুন নতুন জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তবে অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার এদেশে জ্বালানীর সার্বিক অভাব রয়েছে এবং দিন দিন এ অভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গৃহস্থালীতে এবং কোন কোন শিল্পে (যেমন- ইটের ভাটা) ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাঠই প্রধান জ্বালানী। তাই দেশে প্রয়োজনীয় পরিমান উপযুক্ত জ্বালানী না থাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দেশের বনজ সম্পদ।

গৃহস্থালির রান্না-বান্নার জন্য প্রয়োজন জ্বালানির। এটি আমাদের নিত্য দিনের প্রয়োজন। ঢাকা শহরে বর্তমানে রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। কিন্তু যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রান্না-বান্নার কাজে কাঠ, খড়-কুটা, নাড়া, শুকনো গোবর ইত্যাদি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ১০৭ কোটি মণ, এসব প্রচলিত জ্বালানী ব্যবহৃত হচ্ছে। জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহারের ফলে গ্রামাঞ্চলের গাছপালা ক্রমান্বয়ে উজাড় হয়ে যাচ্ছে। এর দ্বারা আমরা শুধু বনজ সম্পদই হারাচ্ছি না, এতে আমাদের আবহাওয়াতেও পড়ছে মারাত্বক ক্ষতিকর প্রভাব। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, এদেশের আশি শতাংশ লোক কৃষিজীবি। পূর্বে কৃষকেরা জৈব সার হিসেবে পঁচা গোবর, নাড়া, খড়-কুটা ইত্যাদিকে ব্যবহার করত, তখন জমির উর্বরা শক্তি বেশী ছিল। কিন্তু বর্তমানে গোবর, নাড়া ও খড়-কুটা ইত্যাদিকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের ফলে, কৃষি জমিগুলি প্রাকৃতিক জৈব সার থেকে বঞ্চিত হয়ে উর্বরতা হারাচ্ছে। এছাড়া আমাদের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় জ্বালানি সংকট বেড়ে যাচ্ছে। এখনই কোন বিকল্প জ্বালানীর সন্ধান করা অতি জরুরী, তা নাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জীবন-যাপন সংকটাপন্ন হয়ে উঠবে।

বায়োগ্যাস

গোবর ও অন্যান্য পঁচনশীল পদার্থ বাতাসের অনুপস্থিতিতে (অবায়বীয় অবস্থায়) পঁচানোর ফলে যে বর্ণহীন জ্বালানি গ্যাস তৈরী হয়, তাকে বায়োগ্যাস বলে। বায়োগ্যাসে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ মিথেন থাকে, তাই একে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মিথেন ছাড়া বায়োগ্যাসে থাকে মূলত: কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2)। সাধারণত অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতায় গোবর ও অন্যান্য আবর্জনা পঁচে বায়োগ্যাস সৃষ্টি হয়। এ গ্যাস উৎপাদনের পর অবশিষ্ট অংশ উন্নত মানের সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বায়োগ্যাস তৈরি পদ্ধতি

বায়োগ্যাস উৎপাদন করতে হলে প্রথমেই তৈরি করতে হবে দুর্ঘটনামুক্ত এলাকায় বায়োগ্যাস প্লান্ট। এ প্লান্টে দুর্গন্ধ বা মশা-মাছির উপদ্রবের সম্ভাবনা না থাকায় এটি রান্নাঘরের কাছেই বানানো যেতে পারে। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এর খুব নিকটে বড় কোন গাছ না থাকে; তাছাড়া বড় গর্ত, নদী বা খাল ইত্যাদির নিকটেও এ প্লান্ট স্থাপন ঠিক হবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণত দুমডেলের প্লান্ট চালু আছে। যথা-

- স্থির ডোম মডেল (Fixed dome model) এবং
- ভাসমান ডোম মডেল (Floating dome model)।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) স্থির ডোম মডেলকে বাংলাদেশের জন্য আদর্শ হিসেবে নির্বাচন করেছে।

নিচে স্থিরডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

স্থির ডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট

বায়োগ্যাসের "স্থির ডোম মডেল" প্লান্টের তিনটি অংশ থাকে। যথা-

১. ডাইজেস্টার
২. হাইড্রলিক চেম্বার ও
৩. ইনলেট ট্যাংক

(১) ডাইজেস্টার

ডাইজেস্টার হলো একটি বড় আয়তন বিশিষ্ট কুয়া। এটির ব্যাস হবে ২৬০ সে.মি. এবং গভীরতা হবে ২২১ সে.মি.। কুয়ার তলদেশ হাড়ির তলদেশের মতো অর্ধগোলাকৃতি হবে এবং কেন্দ্র বিন্দু হতে আর্চের উচ্চতা হবে ৩ সে.মি.। এরপর দুরমুজ করে শক্ত করে নিতে হয়। কুয়ার তলদেশে ৭.৫ সে.মি. পুরু ইট বিছিয়ে তার উপর ৭.৫ সে.মি. পুরু ঢালাই (সিমেন্ট : বালু : খোয়া = ১ : ৩ : ৬) দিতে হবে। এরপর কুয়ার চারিদিকে ২২১ সে.মি. ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকৃতি ১২.৫ সে.মি. পুরু ইটের দেয়াল দিতে হবে। দেয়ালের উচ্চতা ১৫ সে.মি. হলে একদিকে হাইড্রলিক চেম্বারের মুখের জন্য ৯১ সে.মি ৯১ সে.মি এবং এর উল্টো দিকে ইনলেট পাইপ বসাবার জন্য ২০ সে.মি × ২৫ সে.মি. গাঁধুনি খোলা রাখতে হবে। ইনলেট পাইপ (RRC = রড্, কন্ক্রিট, সিমেন্ট বা পিভিসি পাইপ) হবে ১৫ সে.মি ব্যাস বিশিষ্ট এবং একে দেওয়ালের সংগে আনুমানিক ৩০° কোণ করে বসাতে হবে।

চিত্র ১৯.২ ঃ স্থিরডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট

দেয়ালের কাজ মোট ১০৬ সে.মি. হলে আউটলেট ডোরের কাজ শেষ হবে। পরে আউটলেট ডোরের উপর আরও ৩০ সে.মি. পর্যন্ত গেঁথে, দেয়ালের উপরে ৭.৫ সে.মি. (ঢালায়ের অনুপাত = ১ ঃ ২ ঃ ৪) পুরু ঢালাই দিতে হবে। এ ঢালায়ের উপর ৭.৫ সে.মি পুরু ইটের গাঁথুনি দিয়ে ৪৫ সে.মি. আর্চ উচ্চতা (ভিতরের অংশে) বিশিষ্ট গম্বুজ আকৃতির ডোম তৈরি করতে হবে।

ডোমের শেষ মাথায় গ্যাস নির্গমনের জন্য একটি ১.২৭ সে.মি. ব্যাস বিশিষ্ট ২৫ সে.মি. লম্বা জি. আই পাইপ খাড়াভাবে বসাতে হবে। জি.আই পাইপের উপরিভাগে একটি গ্যাস বাল্ব সংযুক্ত করতে হবে। দেয়ালের ভিতরের গাত্রে আউটলেট ডোরের উপরিভাগ পর্যন্ত ১.২৭ সে.মি. (সিমেন্ট : বালু = ১ : ৪ অনুপাতে) পুরু প্লাষ্টার করতে হবে। আউটলেট ডোরের উপরিভাগ থেকে ডোমের ভিতরের সম্পূর্ণ অংশ (গ্যাস চেম্বার) ১:৩, ১:২, ১:১ (সিমেন্ট:বালু) অনুপাতে তিনবার প্লাষ্টার করতে হবে। কিউরিং এর পর ভিতরের ডোমসহ আউটলেট ডোর পর্যন্ত দেয়ালের শুকনা অবস্থায় ১ মি.মি. পুরু মোম বা সিলিকেট প্রলেপ দিতে হবে। ডোমের উপরের সম্পূর্ণ অংশ এবং আউটলেট ডোরের উপর থেকে গ্যাস চেম্বারের বাইরের অংশ ৫ সে.মি. সিসি ঢালায়ের পর নিট ফিনিশিং করে নিতে হবে।

(২) হাইড্রলিক চেম্বার

ডাইজেস্টারের সাথে একপাশে হাইড্রলিক চেম্বার তৈরী করতে হবে। হাইড্রলিক চেম্বার তৈরি করতে ১২.৫ সে.মি. পুরু ইটের গাঁথুনি দিয়ে ৭৬ সে.মি. দৈর্ঘ্য × ৯১ সে.মি. প্রস্থ × ১২৯ সে.মি. উচ্চতা বিশিষ্ট একটি আউটলেট প্যাসেজ এবং

আউটলেট প্যাসেজের উপরে ২১৩ সে.মি. দৈর্ঘ্য × ১৫২ সে.মি. প্রস্থ × ৪৫ সে.মি. উচ্চতা বিশিষ্ট একটি আয়তকার হাইড্রলিক চেম্বার তৈরি করতে হবে। দেয়ালের উচ্চতা ৪৫ সে.মি. হলে উপরের দিকে একটা ওভারফ্লো পাইপ বসাতে হবে বা খোলা পথ রাখতে হবে। হাইড্রলিক চেম্বারের ভিতরের দিকে প্লাস্টার (সিমেন্ট:বালু = ১:৪ অনুপাতে) করতে হবে। ওভারফ্লো পাইপের উপরে আরো ৭.৫ সে.মি. গাঁথুনি দিতে হবে। হাইড্রলিক চেম্বারের উপরের অংশ পাব বা টিন দিয়ে ঢাকতে হবে।

(৩) ইনলেট ট্যাংক

১২.৫ সে.মি. পুরু ইটের গাঁথুনি দিয়ে ইনলেট ট্যাংক তৈরি করা হয়। ইনলেট পাইপের মুখে ৬০ সে.মি. × ৬০ সে.মি. × ৬০ সে.মি. মাপের একটি ট্যাংক তৈরি করা হয়। ট্যংকের ভিতর ও বাইরের অংশ ভালভাবে প্লাস্টার করতে হবে।

ডাইজেস্টার, হাইড্রলিক চেম্বার এবং ইনলেট ট্যাংক তৈরির পর প্লান্টের চারপাশে বালি ও মাটি দিয়ে এমনভাবে ভরাট করতে হবে যেন, ডোমের উপরিভাগ পর্যন্ত মাটির নিচে থাকে।

ইনলেট ট্যাংকের মাধ্যমে কাঁচামাল দেওয়া হয়। ডাইজেস্টারে গ্যাস তৈরি হয় এবং হাইড্রলিক চেম্বারের মাধ্যমে আউট লেট দিয়ে পরিত্যক্ত অংশ (জৈব সার) বাইরে নেওয়া হয়।

প্লান্টটি চালুর পূর্বে ১.৫ - ২ টন কাঁচামাল তথা গোবর, হাঁস-মুরগির মল, মানুষের মল ইত্যাদি প্রয়োজন। কাঁচামাল ও পানির অনুপাত হবে নিম্নরূপ-
গোবর:পানি = ১:১
হাস-মুরগির মল:পানি = ১:২
লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, বড় মাটির চাকা, পাথর, বালি, খড়কুটা ইত্যাদি ইনলেটের মাধ্যমে কুয়াতে না যায়।

বায়োগ্যাসের ব্যবহার

বায়োগ্যাস বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। যথা-

১. এ গ্যাস দিয়ে রান্না-বান্না করা যায়।
২. ম্যান্টল জ্বেলে হ্যাজাক লাইটের মত আলো পাওয়া যায়।
৩. জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে লাইট, ফ্যান, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি চালানো যায় এবং বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালানো যায়।
৪. পাম্পের সাহায্যে জমিতে পানি সেচ করা যায়।
৫. এ গ্যাস দিয়ে গাড়ি চালানো যায়।
৬. এ গ্যাস দিয়ে ফ্রিজ ও ইনকিউবেটর চালানো যায়।

বায়োগ্যাস রেসিডিউ -এর ব্যবহার

বায়োগ্যাস তৈরির সময় রেসিডিউ (অবশিষ্টাংশ) নিম্নলিখিত কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে-

১. উন্নতমানের জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা যায়।
২. মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
৩. মাশরুম চাষ করা যায়।
৪. মুক্তা চাষে ব্যবহার করা যায়।

সারসংক্ষেপ

- গোবর ও বিভিন্ন পঁচনশীল পদার্থ অবায়বীয় অবস্থায় পঁচনের ফলে যে বর্ণহীন গ্যাস পাওয়া যায়, তাকে বায়োগ্যাস বলে।
- বায়োগ্যাসে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ মিথেন থাকে।
- বায়োগ্যাস তৈরির দুটি মডেল প্রচলিত আছে। যথা- (১) স্থির ডোম মডেল ও (২) ভাসমান ডোম মডেল।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের ন্যায় বায়োগ্যাস বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়।
- বায়োগ্যাস তৈরির পর পরিত্যক্ত অংশ উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বায়োগ্যাসের প্রধান কাঁচামাল কি?
ক. খড়কুটা-পানি
খ. মাটি-পানি
গ. গোবর-পানি
ঘ. কয়লা-পানি

২। বায়োগ্যাসে মিথেনের শতকরা পরিমান কত?
ক. ৫০-৬০ ভাগ
খ. ৭০-৮০ ভাগ
গ. ৮০-৯০ ভাগ
ঘ. ৬০-৭০ ভাগ

৩। বায়োগ্যাসে মিথেন ছাড়া আর কি গ্যাস থাকে?
ক. কার্বন-ডাই-অক্সাইড
খ. হাইড্রোজেন
গ. নাইট্রোজেন
ঘ. ক্লোরিন

পাঠ ৩ ঃ এনজাইম ও দুগ্ধজাত দ্রব্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- এনজাইম কি বলতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা এনজাইম উপাদন প্রযুক্তির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- এনজাইম উৎপাদন প্রযুক্তির গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।
- দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনের প্রযুক্তি বর্ণনা করতে পারবেন।
- গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উৎসেচক (Enzyme)

জীবকোষ অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগণিত। প্রতিটি জীবের পরিপাক, শ্বসন, জনন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ সমস্ত জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি ও হার কতকগুলি প্রোটিন জাতীয় যৌগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ প্রকার প্রোটিন জাতীয় যৌগগুলিকেই উৎসেচক বা এনজাইম (Enzyme) বলে।

সংজ্ঞা ঃ যে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ অতি অল্প মাত্রায় বিদ্যমান থেকে জীবদেহে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার পরে নিজে অপরিবর্তিত থাকে, তাকে এনজাইম বলে।

এনজাইমগুলির উৎপত্তিস্থল সজীব কোষ হলেও, অনেক এনজাইম কোষের বাইরেও কাজ করে। কোন কোন অণুজীবের এনজাইম আবাদ মাধ্যমে নিঃসৃত হয় এবং কোষের বাইরে কাজ করে, তাদেরকে বহিঃকোষীয় (extra-cellular) এনজাইম বলে। কোন কোন অণুজীবের নিঃসৃত এনজাইম কোষের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে তথা কোষের অভ্যন্তরে কাজ করে, এদেরকে আন্তঃকোষীয় (intercellular) এনজাইম বলে।

ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা এনজাইম উৎপাদন

অনেক ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক আবাদ মাধ্যমে (কালচার মিডিয়াম) এনজাইম তৈরি করে। এনজাইমগুলি কোষের ভিতরে তৈরী হয়ে কোষের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে অথবা কোষের বাইরে আবাদ মাধ্যমে নিঃসৃত হয়। বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আবাদ মাধ্যমে জন্মানো কোষ হতে বা আবাদ মাধ্যমে নিঃসৃত এনজাইম শিল্প ভিত্তিতে উৎপন্ন করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। এনজাইম প্রযুক্তি বর্তমানে দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্রসমূহের অন্যতম। অণুজীব (যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি) ব্যবহারের মাধ্যমে এনজাইম উৎপাদন, আহরণ, পৃথকীকরণ ও বিশুদ্ধকরণসহ প্রতিটি ধাপেই অনেক জটিল কলাকৌশল জড়িত রয়েছে। এনজাইম প্রযুক্তি প্রয়োগের পূর্বে এনজাইমটি বহিঃকোষীয় নাকি আন্তঃকোষীয় তা জানার পাশাপাশি, নির্দিষ্ট এনজাইমের শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যাবলী ও গুণাগুণ জানা অতিব জরুরী। কেননা অতিরিক্ত তাপ, ক্ষার ও অম্ল pH দ্বারা এনজাইমের প্রকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক যেমন- *Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus* ইত্যাদি থেকে শিল্পভিত্তিক এনজাইম তৈরি করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার অণুজীব থেকে অ্যামাইলেজ, ইনভারটেজ, প্রোটিয়েজ, পেকটিনেজ, ক্যাটালেজ, সেলুলেজ, ল্যাকটেজ ইত্যাদি এনজাইম উৎপাদন করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

এনজাইম উৎপাদন প্রযুক্তির গুরুত্ব

এনজাইমকে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে এনজাইমের ভূমিকা অনেক। ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাপ্ত প্রোটিয়েজ এনজাইম চামড়াশিল্পে, চামড়া থেকে পশম বিমুক্তকরণে ব্যবহৃত হয়। চামড়ার গুণগত মান উন্নয়নে প্রোটিয়েজের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া গ্লু (আঠা) তৈরীতে, জামা-কাপড়ের দাগ পরিষ্কারে, সিল্ক শোধনে, লিনেন -এর উৎকৃষ্ঠ তন্তু তৈরিতে প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

ইস্ট ও ব্যকটেরিয়া থেকে জাইমেজ এনজাইম তৈরি হয়, যা ফারমেন্টেশন বা গাঁজান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার স্টার্চ ও কার্বোহাইড্রেট হতে অ্যালকোহল তৈরি করা হয়। *Bacillus subtilis* থেকে অ্যামাইলেজ ও প্রোটিয়েজ এনজাইম উৎপন্ন হয়, যা বিভিন্ন ফলের রস বা ফলের গুণগত মান উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়।

দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের প্রযুক্তি

বাংলাদেশে দুগ্ধের স্বল্পতা থাকলেও দুগ্ধজাত বস্তু যেমন- মাখন, দৈ, পনির, মিস্টি ইত্যাদি তৈরি থেমে নেই। তবে প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প এদেশে অপ্রতুল, এদের মধ্যে মিল্কভিটা, আড়ং দুগ্ধ উল্লেখযোগ্য দুধ থেকে মাখন, পনির, দৈ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এসমস্ত দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেয়া হয়। নিচে মাখন, পনির ও দৈ তৈরি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো-

১। মাখন (Butter) ঃ দুধের সরকে মন্থন (churning) করে মাখন তৈরি করা হয়। মন্থনের ফলে দুধের পানির অংশটুকু সাদা মোলায়েম অংশকে ভাসিয়ে রাখে। এ সাদা মোলায়েম অংশটি তৈলাক্ত এবং জমাট বেধে পানির উপর ভাসতে থাকে। তরল পানির অংশকে ছানার পানি বলে।

মাখনের গন্ধ ও স্বাদ বাড়ানোর জন্য সাদা জমাট অংশের সাথে দুধরনের ব্যাকটেরিয়া মিশানো হয়। প্রথমে জমাট ক্রিমে *Leuconostoc citrovorum* নামক ব্যাকটেরিয়া মিশানো হয়। এ ব্যাকটেরিয়ার এনজাইম মাখনের সাইট্রেটকে ডাই-অ্যামাইলে পরিণত করে মাখনে আকর্ষণীয় সুগন্ধের সৃষ্টি করে। মাখনের স্বাদ ও সুগন্ধ রক্ষার জন্য পরে এর সাথে *Streptococcus ceremoris* এবং *S. lactis* মিশানো হয়, ফলে মাখনের pH কমে যায় (pH ৪.৩ হয়)। pH কমে গেলে কোন অনাকাি ক্ষত অণুজীব মাখনকে নষ্ট করতে পারে না।

গ্রামাঞ্চলে মাখন তৈরি করতে জমাট ক্সিমের সাথে স্টারটার কালচার (starter culture ঃ তৈরি মাখন) মিশানো হয়। প্রকৃতপক্ষে স্টারটার কালচারে উপরোল্লিখিত ব্যাকটেরিয়াগুলি থাকে।

২। দৈ ও পনির (curd and cheese)

দুধ হতে দৈ তৈরি করতে স্টারটার কালচার মিশ্রিত করা হয়। স্টারটার কালচারে বিভিন্ন ধরনের ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া থাকে, যেমন- *Streptococcus lactis, S. cremonis, S. thermophilus, Lactobacillus helveticus, L. bulgaricus* ইত্যাদি। স্টারটার কালচার তথা ব্যাকটেরিয়া মিশানো দুধকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রেখে দিলে দুধ জমাট বেধে দৈ -এ পরিণত হয়। ব্যাকটেরিয়া থেকে নিঃসৃত এসিড ও দুধের সাথে মিশ্রিত এনজাইম (গাভীর পাকস্থলি থেকে নিঃসৃত) রেনিন (renin) মিলিতভাবে দুধের প্রোটিন অংশ কেজিন (caesin) কে জমাট বাধতে সহায়তা করে, ফলে দুধ, দৈ -এ রূপান্তরিত হয়।

দৈ হতে পনির তৈরি করা হয়। বেশিরভাগ পনির গরুর দুধ থেকে তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে জমাটবাঁধা দুধের তরল অংশটি আলাদা করা হয়। পনিরের ধরণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে, দুধের জমাট বাঁধা অংশে কি পরিমান আর্দ্রতা বিরাজ করছে। সাধারণত তাপ, চাপ ও খন্ড খন্ড করে কেটে পনির -এর আর্দ্রতা কমানো হয়। পনির -এর আর্দ্রতা নির্দিষ্ট ও কাি ক্ষত *মাত্রায় পৌঁছার পর একে চাপের সাহায্যে নির্দিস্ট আকার*-আকৃতি দেওয়া হয়। পনিরে ব্যাকটেরিয়া ও মোল্ড জাতীয় ছত্রাক যুক্ত করা হয়। ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক হতে নিঃসৃত এনজাইম পনিরের গুণগত মান উন্নত করে, ফলে পনির সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু হয়।

পনির প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

- সফ্‌ট পনির বা গৃহ পনির (cottage cheese) বা ক্রিম পনির ঃ এ ধরণের পনিরকে অপরিপক্ক পনির (unripened) বলে। এ পনিরের স্থায়িত্বকাল কম। সতেজ অবস্থায় এ পনির খাওয়া যায়।
- শক্ত দধি পনির (hard card cheese) ঃ এ ধরণের পনির তৈরি করতে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও মোল্ড জাতীয় ছত্রাক ব্যবহার করা হয়। এ সমস্ত অণুজীব থেকে নি:সৃত এনজাইম দ্বারা পনিরের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।
- সেমিসফ্‌ট পনির (semisoft cheese) ঃ এ পনির তৈরির সময় লিপোলাইটিক ও প্রোটিওলাইটিক (Lipolytic and proteolytic) অণুজীবের সাহায্যে পনিরকে নরম, সুগন্ধযুক্ত ও স্বাদপূর্ণ করা হয়।

দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি প্রযুক্তির গুরুত্ব

বাংলাদেশে দুধের পরিমান অপ্রতুল। দুধ থেকে মাখন, ছানা, পনির, দৈ ইত্যাদি বহুবছর পূর্ব থেকে তৈরি করা হচ্ছে। এ ছাড়া ছানা থেকে বিভিন্ন সুমিষ্ট দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে দুগ্ধজাত শিল্পের সংখ্যা নগন্য, এদের মধ্যে মিল্ক ভিটা ও আড়ং দুধ উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে যে পরিমান পাস্তুরিত দুধ বাজারে আসে, তা প্রয়োজনের তুলনায়

অনেক কম। অবশিষ্ট দুধের জন্য আমাদের বিদেশী গুড়াদুধের উপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুধ শিল্পকে একটি লাভজনক শিল্পে পরিণত করা সম্ভব। বহু পূর্ব থেকে দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরির গ্রামীন পদ্ধতি চালু থাকলেও প্রকৃত কারণটি অজানা ছিল। পরবর্তীতে গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, এজন্য বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যাকটেরিয়াই দায়ী। ইতোমধ্যে দুগ্ধজাত দ্রব্যের বিভিন্ন ব্যবসায়িগণ ব্যাকটেরিয়ার কিছু নিজস্ব প্রজাতি (স্ট্রেন) আলাদা করে নিয়েছেন, ফলে সে সমস্ত দোকানের দৈ, পনির ইত্যাদির স্বাদ ও গন্ধ ভিন্নতর। এ সমস্ত কারণে ক্রেতা সাধারণ বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য নির্দিষ্ট দোকানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। সঠিক জৈব প্রযুক্তির ফলে তৈরি হচ্ছে উত্তম পণ্য এবং এনে দিচ্ছে ব্যবসায়িক সাফল্য। এর দ্বারা বেকারত্ব যেমন আংশিক হ্রাস পেয়েছে তেমনি সরকার পাচ্ছেন পর্যাপ্ত ভ্যাট, যা জাতীয় অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সারসংক্ষেপ

- এনজাইম বা উৎসেচক হচ্ছে প্রোটিন জাতীয় এক ধরণের জৈব রাসায়নিক পদার্থ।
- এনজাইম বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বিক্রিয়ার গতিকে বাড়িয়ে দেয়।
- এনজাইম বহি:কোষীয় ও আন্ত:কোষীয়ভাবে উৎপন্ন হতে পারে।
- ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক থেকে বিভিন্ন ধররে এনজাইম উৎপন্ন হয়।
- দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা পালন করে অণুজীবিও এনজাইম।
- এনজাইম দুগ্ধজাত দ্রব্যের স্বাদ ও গন্ধকে বৃদ্ধি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। এনজাইম কোন ধরনের পদার্থ?

ক. প্রোটিন　　খ. চর্বি
গ. আমিষ　　ঘ. ভিটামিন

২। মাখনের স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি করে?

ক. *Penicillium*　　খ. *Rhizopus*
গ. *Leuconostoc*　　ঘ. *Aspergillus*

৩। কোনটি ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া?

ক. *Bacillus subtilis*　　খ. *Streptococcus lactis*
গ. *Pseudomonas* sp.　　ঘ. *Xanthomonas* sp.

পাঠ ৪ ঃ পরিবেশ ও জৈব প্রযুক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- কল-কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে জৈব প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সাগরে পতিত তেল আত্তিকরণে জৈব্য প্রযুক্তির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সিউয়েজ আত্তিকরণে জৈব প্রযুক্তির ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

মানব জাতি যতই সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততই মনুষ্য সভ্যতা এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। সে সংকট হচ্ছে পরিবেশ সংকট বা দূষণ সমস্যা। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে পরিবেশের এ সংকট যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে এটা আজ আর বিতর্কের বিষয় নয়। পূর্বে বলা হত আঠার-উনিশ শতকে ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব ও তার পরবর্তীকালে পৃথিবী জুড়ে নানা ধরণের প্রযুক্তিগত উন্নয়নই মূলত এসব সমস্যার জন্য দায়ী। কিন্তু ক্রমেই এটা স্পষ্টতর হচ্ছে যে, এসমস্ত পরিবেশগত সংকটের জন্য শুধুমাত্র শিল্পপ্রযুক্তিই দায়ী নহে, এরসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও জড়িত।

চারিদিকে পরিবেশের অবনতির লক্ষণ আজ অতি স্পষ্ট। খনিজ জ্বালানিতে যেসব শিল্প-কারখানা চলে সেগুলো দিন-রাত বিপুল পরিমান বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে বায়ুমন্ডলকে দূষিত করছে। এছাড়া কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ, দুর্ঘটনাজনিত কারণে সাগরে তেল নির্গমন এবং মানুষের পরিত্যক্ত জৈব ও অজৈব পদার্থসামগ্রীর সুব্যবস্থাপনার অভাবে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। এর ফলে পরিবেশের বায়ু, পানি ও ভূমি সবই হয়ে পড়ছে দূষিত। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও এ দূষণ প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে ঘটছে। এজন্য দূষণ আজ একটি বিশ্বসমস্যা।

সুন্দর পরিবেশ ঠিক রাখা ও তৈরী করার জন্য দরকার সুন্দর ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। তাই পৃথিবীর মানুষ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মিলিত হচ্ছে একই ছায়ায়, চেষ্টা করছে এর সঠিক প্রতিকারের পথ উদ্ভাবন করতে। ফলে আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। জৈব প্রযুক্তি এদের মধ্যে অন্যতম। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কতিপয় ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক. কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য

আমাদের দেশে বড় শহরগুলিতে অধিকাংশ শিল্প-কারখানাগুলি গড়ে উঠেছে নদীর ধারে। এ সমস্ত শিল্প-কারখানা থেকে প্রতিনিয়ত তরল বর্জ্য পদার্থ পরিত্যাগের ফলে পার্শ্ববর্তী নদীর পানি দূষিত করছে। ক্লোরিন, কস্টিক সোডা ও কারখানার বর্জ্য পদার্থগুলি পানিকে দূষিত করে তুলছে। পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স, শোধনগার, রাসায়নিক সার তৈরীর কারখানা, রাবার ও প্লাসটিক কারখানা থেকে নির্গত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মাটি ও পানি দূষণের প্রধান উৎস। পালিশ করার কারখানা থেকে নির্গত বিভিন্ন ধাতু, যেমন- সীসা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি পানি ও পার্শ্ববর্তী আবাদভূমিকে দূষিত করে। ঔষধ কারখানা থেকে নিঃসৃত নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ, ভূপৃষ্টের উপরিভাগের পানি ছাড়াও ভূ-গর্ভস্থ পানিকেও দূষিত করে। ঢাকায় অবস্থিত চামড়া পাঁকা করার শিল্প প্রতিষ্ঠান, ট্যানারী থেকে প্রতিদিন অতি উচ্চমাত্রায় প্রায় ১৯ হাজার ঘন-মিটার তরল বর্জ্য বের হয়ে আসছে। মহানগরীর পশ্চিম প্রান্তে জনবসতি সংলগ্ন বিস্তৃত জলাভূমিতে এ বিষাক্ত বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ছে। এক গবেষণায় জানা গেছে ট্যানারী থেকে গড়ে প্রতিদিন ১৯ হাজার ঘন-মিটার পানি প্রায় তিন শতাধিক বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রবণ আকারে বের হচ্ছে। নর্দমা পথে বেরিয়ে যাওয়া এ সমস্ত তরল বর্জ্যের পি এইচ (pH) মান ১.৫-১.৩ পর্যন্ত। বিজ্ঞান মতে পি.এইচ. (pH) ৬-৭ মাত্রার হলে তাকে ক্ষতিকর বিবেচনা করা হয় না। এভাবে পানি দূষণের ফলে শুধুমাত্র মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদকূল এখন সমস্যার সম্মুখীন। পানি দূষণের ফলে জলজ জীবের জীবন সংকটাপন্ন হয় এবং ঐ পানি ব্যবহারে মানুষ বা পশু-পাখিদের বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থের মিশ্রণকে এক বা একাধিক স্থানে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ঐ সংরক্ষিত বর্জ্য পদার্থসহ দূষিত পানিকে এক ধরণের পাউডার (ফেরিক্লক, Ferriclock) ব্যবহার করে শোধন করা হয়। জার্মানীতে অ্যালুমিনিয়াম কারখানার বর্জ্য পদার্থ হতে ফেরিক্লক তৈরী করা হয়।

কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যে বিভিন্ন প্রকার অণুজীব জন্মে এবং বর্জ্য পদার্থকে ভেঙ্গে সরল উপাদানে পরিণত করে। ফ্রান্স, জাপান, তাইওয়ান ও ভারতে পেট্রোলিয়াম কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে বিভিন্ন ধরণের ব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Pseudomonas, Nitrobacter, Nitrosomonas, Clostridium* sp. প্রভৃতি) চাষ করা হয়। এ সমস্ত

ব্যাকটেরিয়াকে এককোষী প্রোটিন (single cell protein) হিসেবে পশু ও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ধরণের জৈব প্রযুক্তিতে একদিকে যেমন বর্জ্য পদার্থের পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা করে, অন্যদিকে মানুষসহ অন্যান্য পশুর প্রোটিনের চাহিদা পুরন হয়। কাগজ ও কাগজের মন্ড (pulp এবং paper industry) থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে বিভিন্ন ইস্ট (যেমন- *Torula, Saccharomyces* ইত্যাদি) জন্মায়, যেগুলো অধিক প্রোটিন সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে এ ধরণের জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক নয়, তবে চিনি কল থেকে উৎপন্ন পরিত্যক্ত বর্জ্য ঝোলাগুড় (molasses) কে আমরা মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করে *Saccharomyces cerevisiae* কে ব্যাপক ভাবে চাষ করতে পারি। *Saccharomyces cerevisiae* রুটি তৈরির কারখানায় ব্যবহৃত হয়।

খ. পানিতে তেল নির্গমন

বন্দরে নোঙর করা জাহাজ বা তেলবাহী জাহাজ হতে নিঃসৃত পেট্রোল, ডিজেল বা অপরিশোধিত তেল পানিকে দূষিত করে। পানি দূষিত হওয়ায়, পানিতে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হয়, ফলে অনেক জলজ জীব - এর মৃত্যু ঘটে। সমুদ্রে চালিত তেলবাহী জাহাজ দূর্ঘটনায় পতিত হলে, জাহাজের তেল সাগরে পড়ে পানির উপর পুরু আস্ত রণ সৃষ্টি করে। অনেক সামুদ্রিক পাখি এ তেলের সংস্পর্শে এলে মৃত্যু ঘটে, এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি মারা যায়। সমুদ্রে তেল জনিত দূষণ রোধে অণুজীবের ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর, কেননা এসমস্ত অণুজীব হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং ক্ষমতা সম্পন্ন, অর্থাৎ এরা হাইড্রোকার্বনকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে। *Pseudomonas putida* নামক ব্যাকটেরিয়া কেম্পর, অকটেন, জাইলন ও ন্যাপথালিন, এ চারটি প্রধান হাইড্রোকার্বনকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে। ড. চক্রবর্তী ও তার সহকর্মীরা ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে *Pseudomonas* এর কয়েকটি স্ট্রেইন জেনেটিং ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে তৈরি করেন। *Pseudomonas* -এর এ স্ট্রেইনগুলি অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনকে ভাঙ্গতে পারে। বর্তমানে *Pseudomonas, Mycobacterium, Nocardia* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়াকে সমুদ্রে তেল নিষ্কাশন ও পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

গ. সিউয়েজ আত্মীকরণ

সিউয়েজ হচ্ছে জৈব ও অজৈব পদার্থের তরল মিশ্রণ। বাথরুমের সাবান পানি, রান্নাঘরের খাদ্যের অবশিষ্টাংশ, ময়লা পানি ও পয়:প্রনালী হতে নির্গত মলমূত্র ইত্যাদি হচ্ছে সিউয়েজ পদার্থ। সিউয়েজ পদার্থে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ক্ষতিকর পরজীবী ও প্রোটোজোয়া ইত্যাদি ক্ষতিকর জীবাণু বাস করে। ফলে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন ধরণের রোগের সৃষ্টি হয়, তাছাড়া পরিবেশ দূষিত হয়ে বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে।

সিউয়েজ পদার্থের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগের বেশী থাকে পানি এবং অবশিষ্ট অংশ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, নাইট্রেট, ফসফেট ও ডিটারজেন্টে সমৃদ্ধ থাকে। জৈব প্রযুক্তি দ্বারা প্রথমে সিউয়েজ পদার্থগুলির রূপান্তর করা হয়, পরে রূপান্তরিত পদার্থগুলি প্লান্টের মাধ্যমে অত্যধিক তাপমাত্রার জলীয় বাষ্প দ্বারা জীবাণুমুক্ত করে তারপর বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্যবান সার ও বিশুদ্ধ পানিতে পরিনত করা হয়।

জৈব প্রযুক্তি দ্বারা জৈব যৌগের পচনে *Nitrosomonas, Nitrobacter, Clostridium,* Protojoa প্রভৃতি অণুজীব ব্যবহার করা হয়। *Bacillus denitrificans, Pseudomonas, Micrococcus* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া সিউয়েজ পদার্থের নাইট্রেট যৌগকে ভেঙ্গে মুক্ত বায়বীয় নাইট্রোজেনে পরিণত করে। সবাত শ্বসন ব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Azotobacter*), অবাত শ্বসন ব্যাকটেরিয়া (যেমন *Clostridium*) ও সালোকসংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Clorobium, Rhodospirillum, Rhodopseudomonas*) ইত্যাদি অণুজীব সিউয়েজ পদার্থের উপাদানগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে তরল পদার্থে পরিণত করে।

সারসংক্ষেপ

- জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ দূরীকরণ অনেকাংশে সম্ভব।
- কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে বিভিন্ন ধরণের অণুজীব চাষ করে, তাদেরকে এককোষী প্রোটিন (single cell protein) হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সমুদ্রের তেল নিষ্কাশনে হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং ক্ষমতা সম্পন্ন অনুজীব ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সাধারণ পানির পি এইচ (pH) কত?

ক. ১-৩ খ. ৩-৫

গ. ৬-৭ ঘ. ৭-১০

২। চিনিকল থেকে উৎপন্ন বর্জ্য ঝোলাগুড়ে কোন ধরণের অণুজীর চাষ করা যেতে পারে?

ক. *Pseudomonas* খ. *Clostridium*

গ. *Nostoc* ঘ. *Saccharomyces cerevisiae*

৩। এককোষী প্রোটিন হিসেবে কোন ধরণের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়?

ক. *Pseudomonas* খ. *Aulosira*

গ. *Anabaena* ঘ. *Xanthomonas*

পাঠ ৫ ঃ টিকা ও অ্যান্টিবায়োটিক

এ পাঠ শেষে আপনি—

- টিকা উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন।
- অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তি প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

টিকা (vaccine)

উনবিংশ শতাব্দির শেষ অব্দি পর্যন্ত বসন্ত (small pox) রোগের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানা ছিল না। বসন্ত রোগটি সংক্রামক, কোথাও এ রোগ দেখা দিলে মহামারি আকার ধারন করত এবং আক্রান্ত লোকজনের অধিকাংশই মারা যেত। ফলে কোথাও এ রোগ দেখা দিলে সে স্থানের লোকজন আতঙ্কে অন্য স্থানে পালিয়ে যেত এমনকি আক্রান্ত ব্যক্তির স্বজনরাও অন্যত্র পালাত। ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার (Dr. Edward Jenner) সর্বপ্রথম ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে টিকা দেবার প্রথা প্রবর্তন করেন। এজন্য তাঁকে টিকা আবিষ্কারের জনক বলা হয়। বুইস্ট (Buist, ১৮৮৭ খ্রস্টাব্দে), গুয়ারনিয়েরী (Guarnieri, ১৮৯২ খৃস্টাব্দে) এবং পাশ্চেন (Paschan, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) পৃথক পৃথকভাবে বসন্তের গুঁটি সংলগ্ন কোষ হতে বসন্তের জীবাণু তথা ভাইরাস আবিষ্কার করেন।

টিকা হচ্ছে রোগ উৎপাদনকারি অণুজীবের সাসপেনশন। প্রকৃতপক্ষে টিকা দেওয়া বলতে অণুজীবকে জীবিত, অর্ধমৃত বা মৃত অবস্থায় দেহের মধ্যে প্রবেশ করানোকে বুঝায়। এরা দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করে কোন নির্দিষ্ট জীবাণুর দ্বারা সৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে দেহের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

টিকা প্রধাণত দু'ধরণের হতে পারে। যথা-

- সম্পূর্ণ উপাদানযুক্ত টিকা (Whole-agent vaccine)
- উপ একক টিকা (Subunit vaccine)

সম্পূর্ণ উপাদানযুক্ত টিকার ক্ষেত্রে অণুজীবকে মৃত অবস্থায় অথবা জীবন্ত কিন্তু কর্মক্ষমতাহীন (weakened) অবস্থায় রোগীর দেহে প্রবেশ করান হয়। অন্যদিকে উপ একক টিকার ক্ষেত্রে অণুজীব কোষের কিছু অংশ অথবা অণুজীবিও উপাদান (product) কে টিকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

টিকা প্রদানের ফলে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার রোগী রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়। টিকা তৈরির ক্ষেত্রে সাধারণত যে জীবাণু দ্বারা রোগ সৃস্টি হয়, সেই রোগ সৃষ্টিকারি অণুজীবকেই জীবিত, মৃত বা অর্ধমৃত অবস্থায় অথবা উহা হতে উৎপন্ন রাসায়নিক দ্রব্যকে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে টাইফয়েড জ্বরের টিকা *Salmonella typhi* (টাইফয়েড রোগের জন্য দায়ী) অণুজীবের মৃত কোষ দিয়ে তৈরী করা হয়। পলিওমাইলেটিস রোগের টিকা পলিওমাইলেটিস *(Poliomylitis)* ভাইরাস থেকে তৈরি করা হয়। রেবিস (Rabies) ভাইরাসকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন করে জলাতঙ্ক রোগের টিকা তৈরি করা হয়। ফলে এটি জলাতঙ্ক রোগ সৃষ্টি করতে পারে না বরং কোষে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করতে সহায়তা করে যা জলাতঙ্ক সৃষ্টিকারি জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিহত করে। বসন্তের (small pox) ক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টিকারি ভাইরাস ভ্যারিওলা *(Variola)* -এর পরিবর্তে ভ্যাক্সিনিয়া *(Vaccinia)* ভাইরাসকে টিকা হিসেবে জীবিত অবস্থায় দেহের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। ভ্যাক্সিনিয়া মানব দেহে কোন রোগ সৃষ্টি না করে ভ্যারিওলাকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবডি তৈরি করে, ফলে মানুষ বসন্ত রোগ থেকে রক্ষা পায়।

অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic)

অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic) প্রকৃতপক্ষে মানুষের উৎপাদিত রাসায়নিক বস্তু নয়। অ্যান্টিবায়োটিক একটি জটিল জৈব যৌগ। বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক, অ্যাকটিনোমাইসিটিস এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয়, যাদের বেশির ভাগই মাটিতে বাস করে।

অণুজীব কর্তৃক উৎপাদিত বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে রোগ বিস্তারকারী বিভিন্ন অণুজীবের বংশ বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধা পায়। অণুজীব কর্তৃক উৎপাদিত এবং অন্যান্য অণুজীবের জন্য বিষাক্ত এসব রাসায়নিক পদার্থকে অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণু প্রতিরোধক বলে।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব হতে অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষমতা সম্পন্ন জীবজ পদার্থের কথা জানা যায়, তবে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হতে ধারাবাহিকভাবে এর উপর গবেষণা শুরু হয়। গ্রেথিয়া এবং ডাথ (Gratia এবং Dath) অ্যাকটিনোমাইসিটিস (Actinomycetes) হতে অ্যাকটিনোমাইসিটিন নামক উপাদান আবিষ্কার করেন। উপাদানটি তখন শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়া কালচারে ব্যবহার করা হতো। ১৯২৮ খ্রষ্টাব্দে Alexander Fleming যুগান্তকারী অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন (Penicillin) আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, *Penicillium notatum* নামক এক ধরণের ছত্রাক *Staphylococcus aureus* নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রহিত করে। এমনিভাবে *Penicillium notatum* হতে পেনিসিলিন নামক অত্যাশ্চর্য ঔষধটির আবিষ্কার ঘটে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে S.A. Waksman এসমস্ত রোগ প্রতিরোধকারী জীবজ রাসায়নিক পদার্থের নামকরণ করেন অ্যান্টিবায়োটিকস (Antibiotics)। বর্তমানে প্রচলিত বেশির ভাগ অ্যান্টিবায়োটিক চারটি গণের অণুজীব থেকে পাওয়া যায়। যথা- *Streptomyces, Penicillium, Cephalosporium* এবং *Bacillus*।

অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের প্রযুক্তি

অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের প্রযুক্তি প্রায় একই রকম। নিচে পেনিসিলিন তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো-
সর্বপ্রথম *Penicillium notatum* থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কার করা হয়। বর্তমানে *Penicillium chrysogenum* থেকে বানিজ্যিক ভিত্তিতে পেনিসিলিন তৈরি করা হয়।

প্রথমে *Penicillium* কে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে চাষ করা হয়। মিডিয়ামের pH রাখা হয় ৭-৮ এবং এ ছত্রাকের বৃদ্ধির জন্য তাপমাত্রা ২৪$^{\circ}$ সে. এ স্থির রাখা হয়। অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংকে উপযুক্ত আবাদ মাধ্যম নিয়ে তার মধ্যে *P. chrysogenum* এর কনিডিয়ার সাসপেনসন দ্বারা ইনোকুলেশন করা হয়। ট্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বক্ষণ জীবাণুমুক্ত বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থা রাখা হয়। ইনোকুলেশনের ৭-১৪ দিনের মধ্যে ছত্রাকটি আবাদ মাধ্যমে তিন ধরনের পদার্থ নি:সৃত করে। যথা-

i) হলুদ রঞ্জক পদার্থ (Chrysogenin)
ii) নোটাটিন (Notatin) বা পেনিসিলিন বি (Penicillin B) এবং
iii) পেনিসিলিন (Penicillin)

প্রথম দুটিকে পেনিসিলিন থেকে আলাদাভাবে পৃথক করা হয়। আবাদ মাধ্যমের pH মাত্রা ৮ বা এর অধিক হলে ছত্রাকটির বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর পেনিসিলিন উৎপন্ন হয় না।

ছত্রাকের বৃদ্ধি বন্ধ হলে, পেনিসিলিয়ামের মাইসেলিয়ামগুলি ফার্মেন্টার হতে পেনিসিলিন সংগ্রহকারি ট্যাংকে স্থানান্তরিত করা হয়। সেন্ট্রিফিউজ এবং ফিল্টার -এর মাধ্যমে তরল পদার্থ আলাদা করা হয়। এ তরল পদার্থটিতে বিভিন্ন প্রকার জৈব সলভেন্ট ব্যবহার করে পরে রিক্রিস্টালাইজেশন প্রক্রিয়ায় কেলাশিত পেনিসিলিন তৈরি করা হয়।

নিচে কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক ও তার উৎস উল্লেখ করা হলো-

	অ্যান্টিবায়োটিক		**উৎস (অণুজীব)**
(i)	স্ট্রেপটোমাইসিন	-	*Streptomyces griseus*
(ii)	টেরামাইসিন	-	*Streptomyces rimosus*
(iii)	ক্লোরামফেনিকল বা ক্লোরোমাইসিটিন	-	*Streptomyces venezuelae*
(iv)	ইরাইথ্রোমাইসিন	-	*Streptomyces erythraeus*
(v)	পেনিসিলিন	-	*Penicillium notatum* বা *Penicillium chrysogenum*
(vi)	রেসিট্রাসিন	-	*Bacillus subtilis*
(vii)	পলিমিক্সিন	-	*Bacillus polymyxa*
(viii)	ব্যামিট্রাসিন	-	*Bacillus licheniformis*

সারসংক্ষেপ

- টিকা হচ্ছে রোগ উৎপাদনকারি অণুজীবের সাসপেনশন, যা দেহে প্রবেশের পর কোন নির্দিষ্ট অণুজীবের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- সম্পূর্ণ অণুজীবিও কোষ, কোষের অংশবিশেষ বা উপাদানকে টিকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে একটি জটিল জৈব যৌগ।
- সাধারণত অ্যাকটিনোমাইসিটিস, ব্যাকটেরিয়া ও মোল্ড জাতীয় অণুজীব হতে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপন্ন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বসন্ত (ংসধষষ ঢ়ড়ী) -এর টিকা কোন অণুজীব থেকে তৈরি করা হয়?

ক. *Salmonella typhi*
খ. *Vaccinia* virus
গ. *Variola* virus
ঘ. *Rabies* virus

২। পেনিসিলিনের আবিস্কারক কে?

ক. আলেকজান্ডার ফ্লেমিং
খ. এস. এ. ওয়াকসম্যান
গ. লুই পাস্তুর
ঘ. ড. এডওয়ার্ড জেনার

৩। স্ট্রেপটোমাইসিন কোন অণুজীব থেকে তৈরী হয়?

ক. *Streptomyces rimosus*
খ. *Streptomyces erythraeus*
গ. *Streptomyces venezuelae*
ঘ. *Streptomyces griseus*

পাঠ ৬ ঃ জিন প্রযুক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি তা বলতে পারবেন।
- রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি চিত্রসহ বর্ণনা করতে পারবেন।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic engineering)

জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মাত্র ১০০ বছর পূর্বে গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (Gregor Johann Mendel, 1866)। জেনেটিক্সের দুটি মূল সূত্র আবিষ্কার করেন। T. Boveri এবং E.S. Sutton (খ্রিঃ ১৯০২) ক্রোমোসোমকে হেরিডিটির বাহক বলে আখ্যায়িত করেন। পরে O.T. Avery, C.M. Mcleod এবং Mary Mc Carty, (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে) প্রমাণ করেন যে, জিন কোষে ডি.এন.এ (DNA) একমাত্র উপাদান যা জীবের জিনের সমষ্টিগত মলিকুলার প্রকৃতিবিশিষ্ট। J.D. Watson এবং F.H.C. Crick (১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) ডি.এন.এ -এর মডেল তথা আনবিক গঠন প্রস্তাব করেন। পরে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে G.L. Shapiro ও তাঁর সহকর্মীরা *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়ার ল্যাক্টোজ অপেরন বা ল্যাক (lac) জিনটি পৃথক করেন। বস্তুত এর পর শুধু জিন পৃথককরণই নয়, এক প্রজাতির জিন পৃথক করে অন্য প্রজাতির জিনে স্থানান্তর করা, সংমিশ্রিত জিন জীব তৈরি করা, জিন সংযোজন (splicing), জিনের রিকম্বিনেশন (recombination) বা পুনর্যোজন প্রভৃতি হয়ে পড়ে সমসাময়িক জেনেটিক্সের গবেষণার বিষয়বস্তু। এসব গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেনেটিক্সের এক নতুন শাখা, যার নাম বংশগতি প্রকৌশল বা জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering)। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে, জেনেটিক্সের যে শাখা জিনের পৃথকিকরণ, সংযোজন ও সংশ্লেষণ করে, তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering) বলা হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং -এর মাধ্যমে DNA -এর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে এবং প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে স্থানান্তরিত করে ঐ ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর পরিমানে ইনসুলিন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং -এর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) বলে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি

অধিকাংশ জীবের জেনেটিক উপাদান হলো DNA। বিভিন্ন ধরণের এনজাইম, প্রোটিন এবং RNA অণুর সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর তথ্য DNA অণুতেই সন্নিবেশিত থাকে। মানব কল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোন জীবের DNA -এর পরিবর্তন করে নতুন প্রকৃতির DNA সমন্বয় করার কৌশল ইতোমধ্যে সফলতার সাথে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির দ্বারা জীবের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। **যে টেকনোলজির মাধ্যমে কোন জীবের DNA -তে প্রত্যাশিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা যায় (রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির মাধ্যমে) সে টেকনোলজি বা পদ্ধতিকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি বলে।**

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির মূলনীতি হলো একটি জীব থেকে প্রত্যাশিত একটি নির্দিষ্ট জিন সমন্বিত DNA খন্ড স্থানান্তর করে গ্রাহক বা রেসিপিয়েন্ট কোষে প্রবেশ করানো এবং তথায় উক্ত জিনের বিকাশ ঘটানো। খন্ডিত DNA অংশকে গ্রাহক কোষে প্রবেশ করানোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফরমেশন (transformation) বলে। ট্রান্সফরমেশনের ফলে নতুন জিন সমন্বিত যে জীবের উদ্ভব ঘটে তাকে ট্রান্সজিনিক (transgenic) জীব বলে।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি প্রয়োগে *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এদের কোষে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি অতিরিক্ত বৃত্তাকার DNA অণু আলাদাভাবে থাকে। এ অতিরিক্ত DNA অণুকে প্লাজমিড (Plasmid) বলে। এ প্লাজমিড -এর মাধ্যমে

নতুন জিনের সংযোজন এবং সংযোজিত জিনকে অন্য জীবে স্থানান্তর সম্ভব। ইতোমধ্যে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজনীয় ইনসুলিন উৎপাদক জিন *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে স্থানান্তর এবং ইনসুলিন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে; এছাড়া একটি বৃদ্ধিকারী হরমোন (সোমাটোস্টাটিন) -এর জন্য দায়ী জিন *E. coli* - তে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদে অনেক পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে, যেমন-

i) এ পদ্ধতির দ্বারা উৎপন্ন এক ধরনের তরকারী মার্কিন বাজারে ছাড়া হয়েছে, যার নাম ভেজিস্নাক্স সুইট মিনি পিপার বা মিষ্টি মরিচ।

ii) ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিষ্ঠান ক্যালজিন ইলক জিন প্রযুক্তির সহায়তায় এক ধরনের টমেটো উদ্ভাবন করেছেন, যা সহজে পঁচে না, এ টমেন্টোর নাম রাখা হয়েছে ফ্লাভ স্যাভর টমোটো।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির মূখ্য ধাপসমূহ

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির ধাপসমূহ নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক) প্রত্যাশিত DNA নির্বাচন ও পৃথকিকরণ ঃ রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রথম ধাপ হলো প্রত্যাশিত DNA অণু নির্বাচন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জীবকোষ থেকে কোষ মধ্যস্থিত প্রোটিন, শর্করা, লিপিড ও অন্যান্য অংশ থেকে DNA অণুকে আলাদা করা হয়। DNA অণু আলাদা করতে সাধারণত সিজিয়াম ক্লোরাইড বা সুক্রোজ দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ DNA অণু তৈরি করা হয়।

খ) বাহক নির্বাচন ঃ প্রত্যাশিত DNA অণুকে স্থাপনের জন্য একটি বাহকের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে *E. coli* ব্যাকটেরিয়া -এর প্লাজমিডকে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রত্যাশিত DNA অণুকে প্লাজমিড DNA - তে সংযোজন করা হয়।

গ) প্রত্যাশিত DNA অণুকে ছেদন ঃ এক্ষেত্রে প্রথমে প্রত্যাশিত DNA অণুকে, প্রত্যাশিত DNA থেকে কেটে আলাদা করা হয়। প্রত্যাশিত DNA অণুকে কাটতে একটি বিশেষ এনজাইম (রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ দ্বারা DNA ছেদন করা হয়) ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরণের ব্যাকটেরিয়া থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ টি রেস্টিকশন এনজাইম আবিষ্কৃত হয়েছে, যথা- Eco RI, Hind III, Bam HI ইত্যাদি। রেস্ট্রিকশন এনজাইম DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সাজান (specific base sequences) অংশকে কেটে দেয়। নিচে কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম ও এদের রেস্ট্রিকশন স্থান উল্লেখ করা হলো-

এনজাইম	রেস্ট্রিকশন স্থান
Eco RI	.... G-A-A-T-T-C ....→ .... C-T-T-A-A-G ....
Hind III	.... A-A-G-C-T-T .... → .... T-T-C-G-A-A ....
Bam HI	.... G-G-T-T-c-c .... → .... C-C-A-A-G-G ....

কাটার ফলে DNA অণুর দুটি স্ট্যান্ডের একটি অপরটি থেকে লম্বা থাকে, ফলে প্রত্যাশিত DNA খন্ডটি নতুন DNA অণুর সাথে সহজে যুক্ত হতে পারে। খন্ডিত DNA অণুর প্রান্তদ্বয় আঁঠালো প্রকৃতির হয়, তাই একে আঁঠালো প্রান্ত (sticky end) বলে।

খ) ছেদনকৃত প্রত্যাশিত DNA অণুকে বাহক প্লাজমিডে সংযোজন

এক্ষেত্রে প্রথমে বাহক প্লাজমিডের DNA অণুকে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ দ্বারা ছেদন করা হয়। অত:পর প্লাজমিড DNA -এর ফাঁকা অংশে প্রত্যাশিত DNA খন্ডকে প্রতিস্থাপন করা হয়। প্লাজমিড DNA -এর ফাঁকা অংশে প্রত্যাশিত DNA অণু সংযুক্ত করতে DNA লাইগেজ (DNA-ligase) এনজাইম সহায়তা করে। প্লাজমিড DNA -এর সাথে প্রত্যাশিত DNA অণু সংযুক্ত হবার পর যে DNA তৈরী হয়, তাকে রিকম্বিনেন্ট (Recombinant DNA) বলে।

চিত্র ১৯.৩ ঃ রিকম্বিনেন্ট DNA সৃষ্টি

ঙ) পোষক (host) নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষকে স্থাপন

প্রত্যাশিত DNA অণুর বংশবৃদ্ধির জন্য রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড DNA কে পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করানো হয়। ব্যাকটেরিয়ার কোষ বিভাজনের সাথে সাথে উক্ত কোষে অবস্থিত রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড DNA (প্রত্যাশিত DNA অণু যুক্ত) অণুরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এভাবে প্রত্যাশিত DNA অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

সারসংক্ষেপ

- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে জিনের পৃথকিকরণ, সংযোজন ও সংশ্লেষণ সম্ভব।
- কোন একটি DNA অণুর সাথে অন্য DNA অণু সংযোজনের ফলে যে নতুন DNA অণুর সৃষ্টি হয়, তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA অণু বলে।
- ব্যাকটেরিয়া কোষে মূল ক্রোমোজোম ছাড়া অতিরিক্ত বৃত্তাকার DNA থাকে, একে প্লাজমিড DNA বলে।
- DNA অণু কর্তনে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এবং দু'টি DNA অংশ সংযোজনে DNA লাইগেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি প্লাজমিড DNA কে কাটতে ব্যবহৃত হয়?
ক. অ্যামাইলেজ এনজাইম — খ. প্রোটিয়েজ এনজাইম
গ. রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ — ঘ. সেলুলেজ এনজাইম

২। দুটি DNA অণু সংযুক্ত করতে কোন এনজাইম ব্যবহৃত হয়?
ক. ফিউমারেজ — খ. লাইপেজ
ঘ. DNA লাইগেজ — ঘ. প্রোটিয়েজ

৩। নিচে কোন ব্যাকটেরিয়াতে প্লাজমিড থাকে?
ক. *E. coli* — খ. *Bacillus subtilis*
গ. *Pseudomonas* — ঘ. *Xanthomonas* sp.

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলীঃ

১. বায়োটেকনোলজি বা জৈব প্রযুক্তি বলতে কি বুঝেন? জৈব প্রযুক্তিতে অণুজীবের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. টিস্যু কালচার কি? টিস্যু কালচার প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৩. উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার আলোচনা করুন।
৪. বায়োগ্যাস কি? স্থিরডোম বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরির কৌশল বর্ণনা দিন।
৫. এনজাইম বা উৎসেচক কাকে বলে? ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা এনজাইম উৎপাদন প্রযুক্তি আলোচনা করুন।
৬. দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা উল্লেখ করুন।
৭. কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য অপসারণে জৈব প্রযুক্তির ভূমিকা লিখুন।
৮. টিকা ও অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন প্রক্রিয়া উল্লেখ করুন।
৯. রেস্ট্রিকশন এনজাইম কি? রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরিতে এ এনজাইমের ভূমিকা কি?
১০. চিত্রসহ রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যালন- ২ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ক